উপসংহার

"পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ...মানুষের মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।"[১]—

পংক্তিগুলি ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাস প্রসঙ্গে ব্যবহৃত স্বয়ং লেখকের বক্তব্যেরই পুনরুদ্ধার। তবু উপসংহারে আরও একবার কথাগুলো স্মরণ করতেই হলো। কারণ আজকের পৃথিবীর মানুষ চিঠির অন্তর্গত রস-আস্বাদনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টিকে হারিয়ে ফেলছে। অথবা বলা ভালো অব্যবহারে তা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। যে সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি তা শুধু জটিল নয়, অতিমাত্রায় গতিশীল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে না পারলে মূল কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়তে হয়। আর সমতালে চলতে গেলে জীবনের উপযোগিতা-ভিত্তিক প্রয়োজনের বাইরে আর সবকিছুই বর্জন করতে হয়। সুতরাং সেখানে পত্রের বিস্তার ঘটানোর অবকাশ নেই। পত্রকে শিল্পিত করে তোলার মতো মন বা ধৈর্য নেই। তার চেয়েও বড় কথা, পত্রের বিকল্প ভূমিকা নিয়েছে আজকের এস. এম. এস এবং ই-মেল নামের আধুনিক প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের হাত ধরে আমরা ক্রমশই এমন এক যান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি যেখানে চিঠি শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকুই সিদ্ধ করছে— তাও টাইপ করা হরফে। কালি-কলম-মনের সংযোগশিল্প আজ প্রায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়।

এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচিত বিষয়টি হয়ত বা স্মৃতির প্রতি মমতা প্রদর্শন। তবু এরও প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। কারণ যে সাহিত্যিক পর্বটিকে আমরা নির্বাচন করেছি, সেখানে বিশ্বায়নের আগ্রাসন ছিল না। তাই নিছক প্রয়োজনে, অথবা নিতান্ত অপ্রয়োজনে, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের নানান বন্ধনে, ব্যক্তিত্বের অজস্র উন্মোচনে অথবা দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রমণে চিঠি ছিল এক অপরিহার্য মাধ্যম। জীবনের সঙ্গে যা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছিল তাকে সাহিত্যেও আনা হয়েছিল স্বাভাবিক উপকরণ হিসেবে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের জগতে সুদীর্ঘ পরিক্রমায় আমরা দেখেছি পত্রের বিচিত্র ব্যবহার। বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন ঔপন্যাসিক তাঁদের আঙ্গিক পরিকল্পনার নিজস্ব ধরন অনুসারে পত্রকে উপন্যাসের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। ঘটনার বাঁক পরিবর্তনে যেমন তাঁরা পত্রকে সহায়ক ভূমিকায় নিয়েছেন, তেমনই চারিত্রিক মনোবিশ্লেষণের সহজ সুযোগ নিয়েছেন পত্রের মধ্যবর্তিতায়।

লক্ষ করবার বিষয়, পত্র শুধু উপন্যাসের অঙ্গাভরণ হয়ে থাকে নি, একটা প্রবহমান সময়ের গতিপ্রকৃতিকেও ধরা সম্ভব হয়েছে কাহিনিধৃত পত্রের ভাব, ভাষা ও নির্মাণগত কৌশলে। সময়ের মর্জিবদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রকৃতি বদলেছে, বদলেছে মানুষের মন, পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিরুচি। এই চলমান জীবনকে এবং মানুষকে ঔপন্যাসিকেরা নিজের নিজের ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে উপন্যাসের বয়নে গড়ে নিয়েছেন। এর অনেকটা প্রতিফলন পাওয়া যায় আমাদের অনুসন্ধানে পাওয়া পত্রের সঞ্চয় থেকে। সময়ের মর্জি এবং সাহিত্যিকের মর্জিকে ধরবার জন্যই আমাদের নির্ধারিত অধ্যায়-বিন্যাস।

প্রথম অধ্যায়ে বঙ্কিম উপন্যাসের আলোচনায় আমরা দেখেছি পত্র কিভাবে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে কাহিনিতে তার গুরুত্ব আদায় করে নিয়েছে। পত্র ব্যবহারে বঙ্কিম সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে

কতটা যুক্ত অথবা ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন সে প্রশ্নটা জরুরি হয়ে ওঠে না, যেহেতু সময় ও প্রেক্ষিত অনুসারী পত্র সংযোজনের সঙ্গতির ধারণাটি তাঁর মনে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। উপন্যাসের প্লটকে যেহেতু তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তাঁর ঘটনার নাটকীয় গ্রন্থনায় আকস্মিকতা এসেছে বারবার। চিঠি সেখানে কৌতূহলের অন্যতম কেন্দ্র। তবে প্লটকে গুরুত্ব দিলেও চরিত্রকে কখনোই তিনি নিষ্প্রভ করেন নি। ঘটনার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরিগত আবরণ ভেদ করার কাজেও তিনি সুকৌশলে চিঠির ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের প্রকৃতি অনুসারে পত্রের ব্যবহারে, পত্রের ভাষায়, পত্রের ভঙ্গিতে তারতম্য এসেছে। পত্র-দৈর্ঘও পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'রাজসিংহ'-এর মতো দ্রুত ঘটনাবহুল উপন্যাসে পত্রের পরিসর স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত। অন্যদিকে 'বিষবৃক্ষে'র মতো উপন্যাসে চারিত্রিক মনোবিশ্লেষণে দীর্ঘ পত্রই বেশি উপযোগী হয়েছে। আবার এও লক্ষ করতে হবে, বঙ্কিমের শিল্পীচেতনার সঙ্গে যেহেতু বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণবোধ সংযুক্ত, তাই প্রয়োজনে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতেও বঙ্কিম দ্বিধা করেন নি। তাঁর উপন্যাসের পত্রাবলীতে ঔপন্যাসিকের সেই চিত্তোৎকর্ষ-বিধায়ক নীতিরও প্রতিফলন আছে।

বঙ্কিমের ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস ও রোমান্সমিশ্র কাহিনি এবং সমাজ ও পরিবারভিত্তিক কাহিনির মধ্যে ছোটবড় মোট ৯৫টি পত্র ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষের কলমের ৪৮টি এবং নারীদের কলমে মোট ৪৭টি পত্র পাওয়া যায়। নারীদের লেখা পত্রগুলি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘায়তন এবং তাৎপর্যবিশিষ্ট। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর রুদ্ধ কণ্ঠস্বর অনেক সময়ই চিঠিতে সহজ আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। নারীদের লেখা পত্রগুলিকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তার বহুল প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস প্রযুক্ত অধ্যায়ের শিরোনামে। যেমন — 'বিমলার পত্র', 'আয়েষার পত্র', 'মৃণালিনীর পত্র', 'সূর্যমুখীর পত্র', 'চঞ্চলকুমারীর পত্র'। লেখকের নিজের বলা কথার চেয়ে স্বয়ং নারীদের পত্রের ভাষা তাদের ব্যক্তিত্বকে অনাবৃত করতে অনেক বেশি কার্যকর হয়। আয়েষা বা বিমলার পত্র তার প্রমাণ। সূর্যমুখীর মতো শিক্ষিত নারীর কলমে তার অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা যত সহজ রূপ পায়, শিক্ষার অপর্যাপ্ততার কারণে ভ্রমরের চিঠি সেখানে ততটাই সংকট তৈরি করে।

কখনো কখনো বঙ্কিম প্রয়োজনবোধে পত্রের মূল বয়ানটি অনুপস্থিত রেখে বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। কখনো চিঠির ভাষায় এনেছেন ড্রামাটিক আয়রনি। আরও একটি লক্ষণীয় কৌশল হল অতি সংক্ষিপ্তপত্র অথবা খণ্ডিত বা ছিন্নপত্র ব্যবহার করে ঘটনার রহস্যময় ইঙ্গিত অথবা নাটকীয় কৌতূহলের উপাদান তৈরি করে রাখা। কাহিনিতে দানপত্র আছে, বেনামা পত্রও আছে। বেনামা পত্র কখনো মঙ্গলকারীর পক্ষ থেকে এসেছে, কখনো বা তা দূরভিসন্ধিমূলক। পত্রের একটি ছিন্নাংশ দ্বারা কাহিনির শুরুতে রহস্যের জট পাকিয়ে তুলে অপর ছিন্নাংশ দিয়ে কিভাবে পরিণামে ঘটনার জট খোলা যায় তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শৈল্পিক সংগঠনে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেখানে অন্যতম উপকরণ হিসেবে তিনি পত্রের নানামাত্রিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কখনোই পত্রকে আরোপিত বলে মনে হয় নি। সেগুলি অনায়াসে শিল্পের আত্মার অঙ্গীভূত।

আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ যিনি নিজেই অজস্র পত্রের লেখক এবং সে পত্র শিল্পের অসামান্য ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন— "যাঁদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।"[২] সেই মানুষটি যে নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলিতেও পত্র রচনার অবকাশ রাখবেন সেটাই প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেন নি। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' বা 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস রচনার প্রাথমিক পর্বে অনেকটা বঙ্কিম অনুগামী বলে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত পত্রের মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যতই তিনি স্বাধিকারের

ক্ষেত্রটি খুঁজে পেয়েছেন ততই ব্যক্তিচরিত্রের 'আঁতের কথা' টেনে আনবার প্রয়োজনে মনস্তাত্ত্বিক মাধ্যম হিসেবে তিনি পত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ধর্ম, নীতি অথবা প্রচলিত মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও শুধুমাত্র সেগুলিকেই আঁকড়ে ধরে মানুষের জীবনচেতনাকে খর্ব করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই পাঠকদের নৈতিক প্রকর্ষের জন্য তিনি বঙ্কিমের মতো 'হরদেব ঘোষাল' জাতীয় 'উপদেষ্টা পত্রলেখক' সৃষ্টি করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের ১৩টি উপন্যাসে ১১০টি পত্র সংযুক্ত। তার মধ্যে ৭৮টির লেখক পুরুষ। বাকি ৩৫টি লিখেছে নারী। সংখ্যাগত হিসেবে নারীরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পত্রের মাধ্যমে চিনিয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি। মনোবিশ্লেষণ রীতিতে যুগগত ব্যবধান থাকলেও বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষে'র সূত্র ধরেই যেন বিশ শতকের সূচনা লগ্নে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র আবির্ভাব। দুটি উপন্যাসই বহুপত্র পল্লবিত। সামাজিক নীতির প্রশ্নে কুন্দ এবং রোহিণীর অবৈধ প্রেমকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে পারেন নি বলেই বোধহয় বঙ্কিম তাদের আত্মপ্রকাশের জন্য পত্র-উপকরণকে গুরুত্ব দেন নি। অন্যদিকে বালবিধবার সম অবস্থানে থেকেও বিনোদিনীর জীবন তৃষ্ণার একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চান বলেই 'চোখের বালি'র রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রর চিঠির মাধ্যমে বিনোদিনীর অন্তরে সংরাগময় দাম্পত্যজীবনের প্রতি আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলেন এবং আশার বকলমে বিনোদিনীকে দিয়েই তার হৃদয়বাসনার প্রবল উত্তাপকে প্রকাশ করেন।

কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে এসে পত্র প্রয়োগের পুরনো পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি এমন নয়। 'নৌকাডুবি'র মত উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার তাই ঘটনার গ্রন্থি রচনায় ও গ্রন্থি মোচনেই ব্যয়িত হয়। কিন্তু এ ধরনের উপন্যাস তো রাবীন্দ্রিক ধাতু-প্রকৃতির যথার্থ পরিচায়ক নয়। তাই ঔপন্যাসিক জীবনের প্রান্তিক পর্বে 'শেষের কবিতা' কাব্যোপন্যাসে পত্র-প্রকরণ পৃথক ধরনের একটা শিল্প-মাত্রা এনে দেয়। সমগ্র উপন্যাসটি যে কাব্য-সৌরভে ভরপুর তার সুবাস অনেকটাই মেলে চিঠিতে — চিঠির ভাষাশৈলীতে। কাহিনির সমাপ্তিতে এসে কাব্যিক গদ্যও যেন ঔপন্যাসিকের কাছে যথেষ্ট মনে হয় না, তাই সমাপ্তির চিঠি নিজেই হয়ে ওঠে কবিতা। ব্যক্তিসত্তা অনুভবে জারিত অজস্র পত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের অমূল্য সম্পদ।

আমাদের গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের ১২টি উপন্যাসে মোট ১২৪টি পত্র মেলে, যার মধ্যে ৭২টি পত্র লিখেছে পুরুষেরা, ৫২টি নারী। মানবিক আবেগকে কেন্দ্রে রেখে সমাজ ও পরিবারভিত্তিক বাঙালী জীবনের কথা-কাহিনি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ ঘটনা নির্ভরতা নয়, মননের অতিরেক নয়, কাব্যসুলভ রোমান্টিকতাও নয়, শরৎচন্দ্র মুখ্যত আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়ানুভবের দ্বন্দ্ব-প্রকাশেই পত্রকে ব্যবহার করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-শাসনে পিষ্ট, বঞ্চিত নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও সংবেদনার মনোভাব তাঁর উপন্যাসে কোথাও গোপন থাকে নি। কিন্তু নারীদের নিজেদের লেখা চিঠিতে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবা পরায়ণতার অভ্যস্ত প্রবণতাগুলিই যেন বেশি প্রকাশ পেয়েছে। অন্নদাদিদির মতো ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর যন্ত্রণাময় জীবনকথাতে পাতিব্রত্যের সনাতন সংস্কার বারবার ছায়া ফেলে। নারীর সামাজিক সংস্কারের শিকড় কত গভীরে তার প্রমাণ মেলে রাজলক্ষ্মীর পত্রে— সমাজের মূলস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত সংস্কারের বশেই যাকে পরিণামহীন প্রেমের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আসলে শরৎচন্দ্রের নিজের মধ্যেই সমাজ সংস্থানের প্রতি আস্থা, অথচ সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার যে টানাপোড়েন ছিল, তা থেকে তিনি তাঁর নির্মিত চরিত্রদের রেহাই দিতে পারেন নি। তাই 'বড়দিদি'-র মতো উপন্যাসে বান্ধবী মনোরমাকে লেখা বিধবা মাধবীর চিঠিতে যেমন প্রেমের অপ্রতিরোধ্য আবেগ প্রকাশিত, অন্যদিকে তেমনি মনোরমার প্রত্যুত্তরে আছে সকৌতুক সাবধানবাণী। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ', 'চরিত্রহীন', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি কাহিনিতে পত্র নিছক সংবাদ বহনের কাজটুকুই

সম্পন্ন করেছে। কিন্তু 'গৃহদাহ' উপন্যাসে যেন কিছুটা বঙ্কিমী কৌশলেই মহিমকে লেখা মৃণালের এক ছত্র চিঠির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক অচলার মনে বিভ্রান্তিকর সংশয় জাগিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নির্মম ট্র্যাজেডির পাশাপাশি মধুরান্তিক পরিণামের কাহিনিও দুর্লভ নয়। 'বিপ্রদাসে'র মতো উপন্যাসে বন্দনাকে লেখা দ্বিজদাসের সুদীর্ঘ চিঠি শেষ পর্যন্ত যাবতীয় সংকট ও বিরহে অবসান ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মনোরম উপস্থিতির মধ্যেই শুরু হয়েছিল কল্লোলের কলরোল এবং পূর্ববর্তী কালের সঙ্গে সচেতন বিচ্ছেদ ঘটানোর আয়োজনে "কল্লোল যুগ" নামে একটি স্বতন্ত্র সময়চিহ্ন পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। উপন্যাসের জগতে সেই কল্লোলীয় লেখকদের আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করেছি এবং সেখানে জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধকুমার সান্যালকে ধরেছি একই বৃত্তবন্ধনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সংশয়, বিক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে, পুরনো মূল্যবোধকে রীতিমত জেহাদে নাড়িয়ে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথের অমোঘ প্রভাবকে অস্বীকার ও প্রতিরোধ করার অঙ্গীকার ছিল তাঁদের কণ্ঠে। নগ্ন যৌনতা এবং প্রকট দারিদ্র্যকে কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু অতিরিক্ত পাশ্চাত্য অভিমুখীতা এবং স্ব-সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার নৈকট্যের অভাব শেষ পর্যন্ত বন্ধনমুক্তির নামে তাঁদের রোমান্টিকতার নতুন মোহে জড়িয়েছিল। তাঁদের এই বিশেষ মনোভঙ্গি তাঁদের উপন্যাসধৃত পত্রে খানিকটা হলেও চোখে পড়ে।

নামে কল্লোগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও জীবন পর্যবেক্ষণের জীবনের, জটিল রহস্যে অবগাহনের নিজস্ব দক্ষতায় ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত স্বতন্ত্র পথের পথিক। চরিত্রের অন্তর্গূঢ় জটিলতার আবরণ সরাতে গিয়ে আমরা দেখলাম উপন্যাসের ভাষার মতো তাঁর চিঠির ভাষাও বাহুল্যবর্জিত, নির্মেদ, আবেগ সেখানে রীতি মত অপাংক্তেয়। আর তাই কোনো কোনো চরিত্রের কলমে উচ্ছ্বাসের দোলা লাগলে তার পত্র অপর চরিত্রের কাছে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র মতো কাহিনি তার প্রমাণ। কাহিনির শেষে একটি চিঠিই ভেঙে দেয় অসাধু নটবরের স্বপ্নসাধ। জীবনে পূর্ণতার পরিতৃপ্তির কোনো জায়গাই রাখেন না জগদীশ গুপ্ত। অতীতের কালিমা আর বর্তমানের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি চাওয়া 'লঘু-গুরু'র পতিতা নারীর জীবন স্বপ্ন যদি বা তার চিঠিতে ভাষা পায়, তার স্বপ্নভঙ্গের কথাটিও লেখক জানিয়েছেন সমান নির্মমতায়। তথাকথিত নারীবাদী না হয়েও লেখক নারীর আত্মমর্যাদার দাবিকে কখনো কখনো প্রতিষ্ঠিত করেন চিঠির বয়ানে। স্বামীর ব্যভিচারের কারণে পিতৃগৃহে চলে আসা নারী কিশোরী 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে নিজের অভিমত জানায় চিঠির মাধ্যমে।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অচিন্ত্য সেনগুপ্তের উপন্যাসে চিঠির গুরুত্ব অগ্রাহ্য করা যায় না। একদিকে সেখানে নায়কের জীবনে ব্যক্তিগত সংকট, অর্থনৈতিক সংকটের ছবি যেমন মেলে, তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অভিঘাতে নারীদের খানিকটা হলেও পরিবর্তিত অবস্থানের আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শিক্ষালাভ নয়, কর্মজগতে এবং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও সমকক্ষ হয়ে উঠতে চায় নারী। সেই নতুন চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়েও প্রতিকূল পরিবেশের বাস্তবতার কথাও লেখক স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না। শুধু ঘরের বাইরে নয়, অন্দরের শোষণের ছবিটাও পরিষ্কার হয়ে যায় 'অনন্যা' উপন্যাসের বীথির সঙ্গে তার পিতার পত্র দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে। বিদ্রোহের কথা বললেও লেখক যে ভাবালুতায় গ্রস্ত, 'দিগন্তে'র মতো উপন্যাসের চিঠিই তার প্রমাণ।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী লেখক বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিজীবনে চিঠি লেখাটা ছিল একটা প্যাশান। সেই আসক্তির প্রমাণ আছে তাঁর উপন্যাসের ব্যবহৃত চিঠির আয়তন ও সংখ্যায়। 'ধূসর গোধূলি'-র

প্রোষিতভর্তৃকা নারী প্রবাসী স্বামীর চিঠিকেই জীবনের অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চায়। উচ্চবিত্ত সমাজের নারী সানন্দার প্রজাপতিমন ধরা পড়ে পত্রের আধারে। 'কালো হাওয়া'র কাহিনিতে তো সমস্ত ফাঁক ভরাট করার দায় চিঠির। কল্লোলের ঔপন্যাসিক ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমচেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রেমের রোমান্টিকতার সঙ্গে যেভাবে যৌনতাকে, শরীরী বর্ণনাকে আশ্রয় করেছিলেন চিঠির ভাষায়, তার রক্তিমতা বড়ই স্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ না করে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার উদ্ধত ঘোষণা সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের উপন্যাসে চিঠির ভাষার কাব্যসুষমা পাঠককে 'শেষের কবিতা' বা 'ছিন্নপত্রে'র ভাষাকেই স্মরণ করায়। 'সেদিন ফুটলো কমল' আমাদের বক্তব্যের গৃহীত নজির।

ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠির ভাষায় তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্ব ধরা পড়ে না। তবে কখনো কখনো রহস্যের দুনিয়ায় জট পাকানো ও জট ছাড়ানোর কাজে তিনি চিঠিকে ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ বয়ানের বদলে এনেছেন চিঠির পরোক্ষ বিবৃতি। এমন বয়ানে ধরা পড়ে 'উপনায়ন' উপন্যাসে বিনুর কৈশোর জীবন আর "কুয়াশা" উপন্যাসে স্মৃতিভ্রষ্ট একটি মানুষের সংকট।

প্রবোধকুমার সান্যালের নিজস্ব প্রকৃতিধর্মেই যেন তাঁর উপন্যাসের চিঠিতেও বোহেমিয়ান জীবনদর্শনের ছোঁয়া লেগেছে। তাঁর কাহিনির নারী-পুরুষদের পরস্পরকে লেখা চিঠিতে প্রেমের চেয়ে বন্ধুত্বই বড়। শরীরী বর্ণনা অবশ্য আছে, কিন্তু তা যেন তার অসারতা প্রমাণের জন্যই। পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে প্রবোধকুমার চিঠিকেই একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুবমানসের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের স্বরও ভেসে আসে চিঠিতে। কল্লোলযুগের লেখকদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে না হলেও অন্তত আংশিকভাবে আলোচ্য লেখকের উপন্যাসে ছায়া ফেলে গেছে।

আমাদের আলোচনার পঞ্চম অধ্যায়ের কেন্দ্রে এসেছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক। কল্লোলের কালকে ছুঁয়ে থেকেও বাংলা উপন্যাসের একটি দীর্ঘপর্ব জুড়ে এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র এবং স্মরণীয় অবস্থান। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিশাল ক্যানভাসে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের কাঠামোয় রাঢ়ের জনজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদল সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তবে আমাদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাঁর যে উপন্যাসগুলি আমরা পেয়েছি, সেখানে পত্র একান্তভাবেই ব্যক্তিসম্পর্ক-কেন্দ্রিক। আঞ্চলিক উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবনকথায় পত্রের অবকাশ আপনা থেকেই সীমিত হয়েছে, যেহেতু সেখানকার কুশীলবরা চিঠি লেখার মতন উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ভিন্ন গোত্রের উপন্যাসগুতিে চিঠিকে ঘিরে নানা ধরনের নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে। তাতে সময়ের লক্ষণও দুর্লভ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে 'মন্বন্তর' উপন্যাসে বিজয়দার চিঠি সেন্সর বোর্ডের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে তবেই ছাড়পত্র পেয়েছে। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠী কিভাবে মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে নেয়, আলোচিত চিঠির প্রসঙ্গে লেখক তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

শ্রেণীচেতনা বা সচেতন কোনো রাজনৈতিক বোধ নয়, নয় কোনো প্রখর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির তাড়নায়, বিভূতিভূষণ কলম ধরেছিলেন জীবনের প্রতি একটি সহজ অথচ অকৃত্রিম সংবেদনশীল মন নিয়ে। তাঁর উপন্যাসের মানুষগুলির মত তাদের পত্রের ভাষাও সরল ও সাবলীল। কিন্তু পরিসংখ্যানের হিসেবে তাঁর উপন্যাসে পত্র যতটাই পরিধি অধিকার করে থাকুক না কেন, লেখকের সহজাত প্রকৃতিপ্রেমিক রূপটির, আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ তাঁর উপন্যাসের চিঠিতে নেই। শুধু 'অপরাজিত'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে অপুর শেষ চিঠিতে ঔপন্যাসিকের জীবনভাবনার কিছুটা প্রতিফলন মেলে। বাকি সবগুলিই যেন কেজো চিঠি। আসলে শিল্পের উপকরণগত প্রয়োগে স্বতন্ত্র কোনো সচেতনতা বিভূতিভূষণ কখনোই দেখান নি। চরিত্রকে আত্মকথনের

তেমন সুযোগ না দিয়ে লেখক নির্মাণগ্রন্থির সবটুকুই রেখেছেন নিজের কলমে। সেই কারণেই হয়ত তাঁর উপন্যাসে পত্রের ভূমিকা সীমিত।

তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ থেকে জীবনদৃষ্টিতে একেবারেই স্বতন্ত্র হয়ে যান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় তিনি জীবন ও মনের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর উপন্যাসে পত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু যে কটি পত্র পাওয়া যায়, নির্মোহ বিশ্লেষক মনের প্রতিফলনে সেগুলি অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা পায়। 'জননী' উপন্যাসে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মায়ের যন্ত্রণা ধরা পড়ে তার চিঠির মাধ্যমে। অবশ্য চিঠির বয়ান সেখানে অনুপস্থিত। লেখকের পরোক্ষ বিবৃতিই পাঠককে বিষয় সম্পর্কে অবগত করায়। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' উপন্যাসে রহস্যময়ী নারী তরঙ্গ আত্মহত্যার আগে একটি চিঠি লিখেছে, সে চিঠি প্রহেলিকায় পূর্ণ। তাতে মনের অস্থিরতাটুকুই শুধু প্রকাশ পায়। জীবনকে শেষ করে দেওয়ার আগে এমন ধারা চিঠি আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসে আরও এক চরিত্রকে লিখতে দেখেছি। সেও এক নারী। ''চতুরঙ্গ'' উপন্যাসের ননীবালা। জ্যাঠামশাই ও শচীশের অযাচিত করুণা সে গ্রহণ করতে পারে নি। পিতৃসম জ্যাঠামশায়ের কাছে প্রণাম জানিয়ে এবং ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে মৃত্যুর পূর্বে সে চিঠি লিখেছিল। মানিকের অন্যান্য উপন্যাসে চিঠিতে জীবনের জটিলতার নানা দিক ফুটে উঠেছে। 'চিন্তামণি'র মতো উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক সংকটের দিকগুলি চিঠির ভাষায় পরিস্ফুট। নিছক অন্ন সংস্থানের জন্য গ্রাম্য অশিক্ষিত যে নারীকে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হয়, সহোদরাকে চিঠি লেখার মত অক্ষরজ্ঞানও তার নেই। এই নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে তার হয়ে চিঠি লিখে দেবার জন্য অর্থেরও দাবি আসে। মূল্যবোধের ভাঙনের দিকটি চিঠিকে উপলক্ষ্য করে প্রকট হয়ে ওঠে।

আমাদের আলোচনার পরবর্তী অধ্যায় মননপ্রধান ঔপন্যাসিকদের নিয়ে। লক্ষ করতে হবে কল্লোলের বিদ্রোহের উন্মাদনা যতখানি ছিল, তদনুযায়ী পরিণতি দেবার মতো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছিল না। আর তাই আধুনিক হওয়ার নামে শেষ পর্যন্ত আবেগের কাছে তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াতেই এল নতুন ধারার মননভিত্তিক উপন্যাস। এই ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হিসেবে আমরা পেয়েছি ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, গোপাল হালদার ও দিলীপকুমার রায়কে। বলা বাহুল্য, তাঁদের উপন্যাসে সংযোজিত পত্রাবলীও সেই মননভূমিরই ফসল। অবশ্য পত্রসংখ্যার দিক থেকে একমাত্র ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসই উল্লেখযোগ্য।

অন্নদাশঙ্করের ছয় খণ্ডে বিভক্ত ''সত্যাসত্য'' উপন্যাসে বয়ানহীন চিঠির যেটুকু বক্তব্য পাওয়া যায় তাতে বিবাহ সম্পর্কে নায়কের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যই বিবাহ এমন চূড়ান্ত মনোভাবের নিদর্শন মেলে। দিলীপকুমার রায়ের 'দুধারা' উপন্যাসে আমরা একটি নতুন ধরনের টেকনিক দেখেছি, যেখানে আত্মহত্যাকারী মিনার প্রেমিককে পাঠানো তার স্বামীর চিঠি মিনার লেখা ডায়েরির সঙ্গে সহযোগে ভিন্ন তাৎপর্য পেয়েছে। অন্যদিকে গোপাল হালদার সক্রিয় রাজনৈতিক হওয়ার সুবাদে তাঁর আত্মকথনরীতির উপন্যাস 'একদা'য় চিঠি কখনো কখনো গোপন সংবাদের ইঙ্গিত দিয়ে রাজনৈতিক আবর্তকে তুলে ধরেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' 'আবর্ত্ত' 'মোহানা'র চিঠির ভাষা সবুজপত্রী বৈদগ্ধ্যের ভাষ্য। উপন্যাস তিনটির মধ্যে ''অন্তঃশীলা''তেই চিঠি সবচেয়ে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছে। লেখকের জীবনদর্শনের অনেকটাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে নায়ক খগেনবাবুর চিঠির ভাষায়। চিঠির আলোচিত বিষয় এবং চিঠির পরিসর যেন প্রাবন্ধিক রচনা হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। তাতে উপন্যাসের স্বাদ কিছুটা খর্ব হয়েছে সন্দেহ নেই।

আমাদের আলোচনার সপ্তম অধ্যায়টি শেষতম হলেও আদৌ গুরুত্বে নগণ্য নয়। বাংলা উপন্যাসে পুরুষ লেখকদের একাধিপত্য তবুও পুরুষতন্ত্রের শাসনের মধ্যে ধীরে ধীরে নারীরাও নিজেদের অধিকারের

জমিটা তৈরি করতে শুরু করেছিলেন এবং উপন্যাসের কলাকৌশলগুলিও ধীরে ধীরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের উপন্যাসেও অনিবার্যভাবেই চিঠির একটা ভূমিকা তৈরি হয়ে গেছে। নারী ঔপন্যাসিকদের কলমে নারীদের লেখা চিঠি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ পুরুষ লেখকেরা নারীদের মন বোঝার চেষ্টা করলেও সামাজিক অনুশাসনের বোধ তাঁদের চেতনে অথবা অবচেতনে সবসময়ই সক্রিয় থেকেছে। অন্যদিকে নারী-লেখকেরা অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে যেন মনস্তাত্ত্বিক বোধের অনেক নিকটবর্তী হতে পেরেছেন এবং পুরুষ দ্বারা নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ও নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁদের কণ্ঠস্বর যুগোচিত বলিষ্ঠতা পেতে শুরু করেছে। চিঠিতে নারীদের আত্মকথনের সুযোগে সেই ভিন্ন সুর ও স্বরগ্রামটি আমরা খুঁজে নিতে চেয়েছি। উনিশ শতকের প্রান্তিক পর্বে স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' উপন্যাসে নায়িকা মৃণালিনী ওরফে মণির চিঠি তার প্রমাণ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নানাবিধ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও প্রাগ্রসর সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত স্বর্ণকুমারীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শিক্ষিতা নারীর জীবনের সুচিন্তিত দাবিকে প্রতিষ্ঠা করা।

অবশ্য প্রগতির পাশাপাশি পিছুটানের চিহ্নও নেই এমন নয়। বিশ শতকের নতুন যুগপটভূমিতে দাঁড়িয়ে নারীজীবনের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়েও নিরুপমাদেবীর মতো ঔপন্যাসিকেরা পুরুষনিয়ন্ত্রিত সামাজিক বিধানের মূল কাঠামো থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেন নি। ফলে পুরুষের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে সমালোচনায় মুখর হওয়ার পরিবর্তে দুই সপত্নীর মধ্যে সহৃদয়তায় সম্পর্কই গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেইসব ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল নারীদের কলমে সেন্টিমেন্টের প্রাবল্য অলক্ষ নয়। তুলনায় পূর্ণশশীদেবীর উপন্যাসে নারীদের চারিত্রিক বনিয়াদ অনেক দৃঢ়। স্বামীর অত্যাচার পরম সহনশীলতায় মেনে না নিয়ে প্রয়োজনে তারা গৃহত্যাগও করে অথবা রুজিরোজগারের জন্য বাড়ির বাইরেও পা রাখে। এ জাতীয় নারীদের চিঠিতে আবেগের স্পর্শ থাকলেও ভাষা কিন্তু সবলার ভাষা।

এই পর্বে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে সবচেয়ে আধুনিক বলে মনে হয় ঔপন্যাসিক জ্যোর্তিময়ী দেবীকে। নরনারী নির্বিশেষে সকলের আর্থিক স্বনির্ভরতার উপরেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারী পুরুষ উভয়ের পত্রের ভাষাতেই তিনি সমান সংবেদনশীল, সমান সযত্ন। নারী হিসেবে পুরুষদের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। তবু যেন তাঁর উপন্যাসের চিঠিতে নারীর কলমের জোরটাই বেশি করে চোখে পড়ে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক আবহে সেটাই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। চার দেয়ালের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে, বিবাহ সম্পর্কে অভিভাবকীয় আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে নারী কতটা সচেতন হয়ে উঠতে পারে, জ্যোতির্ময়ীর উপন্যাসে চিঠিগুলি তার দুর্লভ নজির।

আমাদের আলোচনায় সময়ের অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে এসেছি আমরা। উনিশ শতকের নতুন চেতনার জাগ্রত আবহে বাংলা উপন্যাস যাত্রা শুরুর মুহূর্ত থেকে জীবনের প্রদর্শশালায় পত্রের প্রার্থিত ভূমিকাটি নির্ধারিত করে দিয়েছিল। নানা পালাবদলের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের নানা পরিবর্তন, নানা নিরীক্ষার মধ্যেও উপকরণটির প্রয়োজনীয়তা কখনোই হারিয়ে যায় নি। একালের ঔপন্যাসিক সংবাদ বা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে হয়ত বা ধীরে ধীরে সময়ের দাবিতেই পত্রের ব্যবহার বর্জন করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু যে সময়টিকে আমরা নির্বাচন করেছি, তার প্রকৃতিধর্মেই পত্রের ব্যবহার অনিবার্য হয়েছে। উপন্যাস যে রীতির হোক, যেমন পরিসরের হোক, প্রয়োজনিক তাগিদের বাইরেও আত্মপ্রকাশের এমন সফল মাধ্যমটিকে ঔপন্যাসিকেরা নানা কৌশলে প্রয়োগ করেছেন বারবার। চিঠি সেখানে শুধু মানুষের মনের নয়, সময়েরও জলছবি।

তথ্যসূচী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ছিন্নপত্রাবলী, ১৯৮নং পত্র, বিশ্বভারতী, ১৪০৯। পৃ.২৯১